সিস্টার রেবেকা

"এই যে, এদিকে।" হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো নার্স ডি'সুজা।

মীনা দেখলো ছোট্ট পরিচ্ছন্ন ঘর। দু'টো বেড রয়েছে। খানকতক বেতের চেয়ার ও একটি ড্রেসিং টেবিল। এ বাড়িটা ফ্যামিলি ওয়ার্ডের মেন বিল্ডিং থেকে একটু দূরে। ছোট্ট কটেজ ধরনের বাড়ি। মাত্র গোটা তিন চার ঘর ও টানাবারান্দা। চুনবালি-খসা দেয়াল। দরজা জানলা-গুলোরও জরাজীর্ণ অবস্থা।

"এটা আসলে নার্সদের রেস্টরুম হিসেবেই ব্যবহার হয়। বিবাহিত নার্সরা, যারা মেসে থাকে না, তারা অফ্ ডিউটিতে বিশ্রাম নেয় এখানে। মিসেস মেনন বলেছেন এ ঘরটা আপনি নিতে পারেন - অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আর, আপনি যদি ফ্যামিলি ওয়ার্ডে থাকা প্রেফার করেন তবে সেই মত ব্যবস্থা হবে।"

"না, না, এখানে থাকতে একটুও অসুবিধা হবে না আমাদের।" ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে মীনা।

"তাহলে আপনারা এখানে বসুন, আমি এক্ষুণি আয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা খাট এনে দেবে আর বিছানাপত্র করে দিয়ে যাবে। কোন কিছুর দরকার হলে ডিউটি নার্সকে জানাবেন। আপনাদের যেন কিছুমাত্র অসুবিধে না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে বলেছেন মিসেস মেনন।"

সিস্টার তখনকার মত বিদায় নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জন আয়া ধরাধরি করে একটা খাট আনল। তিনটা বেডে সাদা ধবধবে বিছানা হল। বাবলু ও মালাকে শুইয়ে কম্বল ঢেকে দিয়ে ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল মীনা। গত ক'দিন ধরে কম ধকল যায়নি তার উপর দিয়ে। ক'দিন কেন, ক'মাসই বলা চলে। এলাহাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোরে বদলী হওয়ায়

কি খুশীই না হয়েছিল ওরা।

সবাই বলেছিল, "প্রাইজ পোস্টিং। অত ভাল যায়গায় যাচ্ছ, তোমাদের বরাত ভাল।"

কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে পা দিয়েই ছেলেমেয়ে দু'টো দারুণভাবে ভুগতে শুরু করল। প্রতি সপ্তাহে জ্বর আসে। একজন ভাল হতে না হতেই আরে একজনের অসুখ হয় - আবার সে সেরে ওঠার আগেই প্রথমজন আরেক দফা পড়ে। ডাক্তার বলল, টনসিল অপারেশন ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু অপারেশন করা হবে বললেই তো আর হল না। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অপারেশনের দিন ঠিক হয়, আর ঠিক তার দু'দিন আগেই তেড়ে জ্বর আসে। ফলে আবার পিছিয়ে দিতে হয় দিন। পরপর ক'বার এরকম হওয়ার পর অবশেষে মরীয়া হয়ে উঠলেন ই. এন. টি. স্পেশ্যালিষ্ট স্কোয়াড্রন্ লীডার সিন্হা।

বললেন, "এদের এবার আর ওষুধ বন্ধ করা হবে না। পেনিসিলিন চলতে থাকুক ঠিক অপারেশনের আগে পর্যন্ত।"

কড়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে আর জ্বরে ভুগে ভুগে হাড্ডিসার হয়ে গেছে বাচ্চা দু'টো। লেখাপড়াও শিকেয় উঠেছে ওদের। আগে শরীর, তারপরে তো পড়াশুনা। যাক, আর মাত্র ক'ঘণ্টা। কাল সকাল সকাল অপারেশনটা হয়ে যায় যেন। মীনার স্বামী তপন এর আগে পরপর দু'বার ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিল বাচ্চাদের অপারেশন হবে বলে; দু'বারই শেষ মুহূর্তে উইথ-ড্র' করতে হয়েছে সে দরখাস্ত। এবার আর ছুটি নেয়নি সে।

আয়া নিঃশব্দে চায়ের ট্রে টেবিলে রেখে গেল। বাবলু ও মালা ঘুমোচ্ছে। চায়ের কাপটা টেনে নিল মীনা। বিস্বাদ ঠাণ্ডা চা, - এক চুমুক খেয়ে সরিয়ে রাখল। আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এল। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে আছে। ঘরের মধ্যে ছিল বলে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। বিকেল চারটে, কিন্তু এরই মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে যেন। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। এ বাড়িটা মেন বিল্ডিং-এর পিছন দিকে। লোক চলাচল কম। এসময় কাউকেই দেখতে পেল না মীনা। ওদের পাশের ঘর থেকে আওয়াজ আসছে - কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। ওঘরে একজন বৃদ্ধা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলাকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল

মীনা। বোধহয় সে-ই এখন উঠে পায়চারি করছে।

দেখতে দেখতে জমাট বেঁধে অন্ধকার নেমে এল, সেইসঙ্গে সোঁ-সোঁ করে তীব্র ঝড় ও বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। বাবলু ও মালা চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বেজে গেছে। ওষুধ খাওয়াতে হবে। গ্লাসে জল ভরে ওদের ডাকতেই চোখ খুলে তাকাল দু'জনে। দুর্বল ক্লান্ত শরীর - নিঃঝুম হয়ে আছে। ওষুধ খাইয়ে আবার শুইয়ে দিল ওদের। বাইরে ততক্ষণে তাণ্ডব বেঁধে গেছে। ঝড়ের দাপটে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকছে বৃষ্টির ছাট। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে ছিটকিনি ভাঙা। একটা চেয়ার দিয়ে চেপে রাখল দরজার পাল্লা দু'টো। টেবিলের উপর একটা ম্যাগাজিন পড়ে আছে - এইমাত্র আদ্যোপান্ত পড়েছে সেটা, তবু আবার সেটাই খুলে বসল। খানিক পরে আলো নিভে গেল। চারিদিকে নিশ্ছিন্দ্র অন্ধকার। বাবলু ও মালা ক্ষীণস্বরে ডেকে উঠল।

"এই যে, এই তো আমি ----" অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাচ্চাদের খাটের কাছে গিয়ে বসল মীনা। দু'জনের গায়ে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল, "ঝড়ের জন্যে পাওয়ার অফ হয়ে গেছে, এক্ষুণি আবার এসে যাবে। ঘুমোয় তোমরা।"

অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে মীনা। কোথাও এতটুকু আলোর রেশ দেখা যায় না। দু'একবার উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সীমাহীন অন্ধকার। চারিদিকে সোঁ-সোঁ, গোঁ-গোঁ আওয়াজ - ঝড়ে যেন ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যাবে ! তপন বোধহয় এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। ছ'টা থেকে ভিজিটিং আওয়ার। কিন্তু এই প্রলয় না থামলে অফিস থেকে বেরুনো মুশকিল। কড়-কড়-কড়াৎ। কাছেই কোথাও বাজ পড়লো। চোখ ধাঁদিয়ে গেল মীনার। গা ছমছম করতে থাকে ওর। এই দুর্যোগে অসুস্থ দু'টি শিশু নিয়ে কতক্ষণ এভাবে কাটাতে হবে কে জানে ! সঙ্গে একটা টর্চও আনেনি। হাসপাতালের ডাক্তার, সিস্টার, আয়ারাই বা সব গেল কোথায় ! তক্ষুণি মনে পড়ল তার এটা রেগুলার ওয়ার্ড নয়। স্থানাভাবের জন্য এ কটেজ'টায় থাকতে দিয়েছে ওদের। এখানে যে রুগী আছে সে কথা হয়ত মনেই নেই কারো। মনে থকলেও, মাঠ ভেঙে খবর নিতে কে আসবে এই দুর্দান্ত ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে।

হঠাৎ ঝড়ের গোঙানি ছাপিয়ে কার কণ্ঠস্বর শুনলো মীনা, "প্লীজ্ ওপেন দ্য ডোর, ভগবানের দোহাই দরজা খোল ----" আর্তকণ্ঠে অনুনয় করছে কেউ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার সরিয়ে দরজা খুলতেই জলের ছাটে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল তার।

ওকে ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধা আগন্তুক ফিসফিস করে বললো, "শীগ্গীর দরজা বন্ধ কর, ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।"

মীনা বুঝলো এ পাশের ঘরের সেই ভদ্রমহিলা।

"কে এসে পড়বে? কি হয়েছে?"

"আস্তে ! ওরা এখনও জানে না যে আমরা এখানে আছি। আমার ঘরে সবকিছু আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে। ভগবানকে ধন্যবাদ অন্ধকারের জন্যে ওরা দেখতে পারছে না।"

"কিন্তু ওরা কারা? ক'জন? কেন এসেছে এখানে?"

বুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি ঘরে পায়চারি করছিলাম, হঠাৎ আলো নিভে গেল। তারপর দেখি পিছনের বারান্দা দিয়ে দুটো লোক দেয়াল ঘেঁষে আস্তে আস্তে আসছে। তক্ষুণি বিদ্যুৎ চমকালো আর সেই আলোতে ওদের হাতের ছোরাও চক্‌চক্ করে উঠলো। আমি বাথরুমের দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। ওরা টের পায়নি। এখনও খুঁজছে ----"

বুড়ির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে তখনো। মীনার রক্ত হিম হয়ে এলো। হাসপাতালের একপ্রান্তে রয়েছে ওরা। ঘরের পিছনে উঁচু ঘন হেজ। তার ওপারে রাস্তা। এই দুর্যোগের মধ্যে দু'জন কেন দু'ডজন লোক ঢুকে পড়লেও কেউ টের পাবে না, আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ তাদের সাহায্য করতে আসবে না, কারণ ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে ডুবে যাবে তাদের আর্তনাদ। ভগবান! ওর কপালে কি শেষে এই ছিল? বুড়ী মাটিতে বসে বিড়বিড় করে একমনে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। মীনাও মনে মনে দূর্গা নাম জপ করতে লাগলো। বাবলু মালাও বুঝতে পারে যে কোন বিপদ ঘটেছে। শুকনো মুখে কাঠ হয়ে বসে আছে দু'জনে।

হঠাৎ বুড়ী লাফিয়ে উঠলো, "শীগ্গীর দরজাটা ঠেলে ধরো, ওরা

এসে গেছে।"

মীনা ও বুড়ী দু'জনে প্রাণপণে দরজার পাল্লা দুটো ঠেলে রাখে। ওদিক থেকে আলোর ক্ষীণ আভা দেখা দেয়।

"দরজা খোলো, শীগ্‌গীর দরজা খোলো ----"

"ভগবান রক্ষা করো, তোমার সন্তানদের প্রাণ বাঁচাও ----" গড় গড় করে বলে যায় বুড়ী আর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে রাখে দরজার পাল্লা দুটো।

বাবলু ও মালা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ওপাশ থেকে দরজায় দুমদাম আওয়াজ হয়।

"একি, দরজা খুলছো না কেন? শীগ্‌গীর খোলো, ভিজে গেলাম আমরা।"

এ তো মেয়ে মানুষের গলা ! মীনা দরজা খুলতে গেল।

মীনার দু'হাত চেপে ধরলো বুড়ী, "তুমি কি পাগল হয়েছো? আমাদের এক্ষুণি মেরে ফেলবে ওরা। কচি বাচ্চা দুটোকেও ছাড়বে না।"

মীনা জোর করে বুড়ীকে সরিয়ে দরজা খুলে দিল। সিস্টারের পেছনে আয়া লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকলো।

"এ সব কি ব্যাপার?"

মীনা সংক্ষেপা সব কথা বললো।

সিস্টার আয়াকে ইশারা করতেই সে বুড়ীর হাত ধরলো, "নিজের ঘরে চলো।"

বুড়ী করুণ চোখে তাকাল মীনার দিকে।

মীনা বললো, "উনি বলছিলেন ও ঘরে কেউ ঢুকেছে, ঘরটা একটু দেখে নেবেন না?"

"এই তো আমরাও সঙ্গে যাচ্ছি।"

নার্স ও আয়া দু'জনে দু'হাত ধরে বুড়ীকে নিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে ওদের কথা শুনতে পেল মীনা।

বুড়ীকে বকছে নার্স, "ও ভদ্রমহিলা নতুন এসেছে, ওকেও

নাজেহাল করেছ তুমি ----"

বুড়ী জবাবদিহির সুরে বলছে, "আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের ---- ওইখানে দাঁড়িয়েছিল ---- হাতের ছোরা চকচক করছিল ----"

একটু একটু করে তার স্বর ক্ষীণ হয়ে এলো, তারপর আর কিছু শোনা গেল না।

রাত্রে নাইট সিস্টার রাউণ্ড দিতে এলে তাকে বুড়ীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলো মীনা। বিকেলের ঘটনা সম্বন্ধে তখনো খটকা যায়নি তার।

সিস্টার বললো, "পাশের ঘরে মিস্ এরিকা রবার্টসন্ থাকেন। অনেক বছর আগে এই হাসপাতালেই মেট্রন ছিলেন উনি। ওঁর বাবা রেলের বড় অফিসার ছিলেন, রিটায়ার করার পর বিলেতে সেটল্ করেন। মিস্ রবার্ট-সনের মত দক্ষ নার্স তখনকার দিনেও বিরল ছিল।"

"কিন্তু বিকেল বেলা উনি ওভাবে ছুটে এলেন কেন? বললেন ছোরা নিয়ে দু'জন লোক ঢুকেছে ঘরে। ওঁর কি মাথার গোলমাল আছে?"

"আরে না, না, মাথার গোলমাল নেই। তবে বুড়ো মানুষ তো, চোখ কানের জোরও কমে এসেছে ----।"

সিস্টার উড়িয়ে দিতে চাইলো ঘটনাটা। মীনার নিজেকেই দোষী মনে হতে লাগলো। তার তো চোখ কান যায়নি এখনো, সে কেন বুড়ো মানুষের কথায় অমন পাগলামী করলো।

পরদিন বাবলু-মালাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। ও.টি.-র পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলো মীনা। অফিসে যাওয়ার মুখে তপন দেখে গেল ওদের। আবার বিকেলে আসবে। মীনা জানে টনসিল অপারেশন কোন মেজর অপারেশন নয়, হমেশাই হচ্ছে আজকাল। তবু মনটা ভারি হয়ে রইলো। অপারেশনের ঘণ্টা দুয়েক পর বাচ্চাদের স্ট্রেচারে করে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। মীনাও ওদের সঙ্গে এলো।

তখনো ওদের জ্ঞান ফেরেনি। খানিক পরে চোখ খুললো মালা, তার একটু পরে বাবলু। কথা বলতে পারছে না, ইশারায় জল চাইলো।

সিস্টারের কথামত ভিজে তুলো দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিলো ওদের, "লক্ষ্মী সোনা, এখনও জল খাওয়া মানা কিছুক্ষণ। সোনা ছেলেমেয়ে,

আর কিচ্ছু ভাবনা নেই। ক'দিনেই সেরে উঠবে। আর রোজ রোজ গলা ব্যথা আর জ্বরে ভুগতে হবে না।"

সত্যি ভারি লক্ষ্মী বাচ্চা দু'টো। জলের জন্যে জিদ করলো না বা কাঁদলো না। চুপ করে শুয়ে রইলো। মীনা দুটো বেডের মাঝখানে চেয়ারে বসে দু'জনের গায়ে হাত বোলাতে লাগলো।

বিকেলে তপন এলো। বড় ফ্লাস্ক ভর্তি আইসক্রীম এনেছে। মালার জন্যে এনেছে সুন্দর একটা ডল পুতুল, বাবলুর জন্যে এক্সরে গান। ক্ষীণ হাসি ফুটলো ওদের ম্লান, ফ্যাকাসে মুখে।

তপন বললো, "আজ তো তোমাদের কথা বলা মানা। আমি কথা বলি, তোমরা শুধু শোন।"

তপন যাবার পর রাত্রের খাবার আনলো আয়া। বাচ্চারা দু'তিন চামচ আইসক্রীম খেলো শুধু। ওরা ঘুমুলে তপনের আনা নতুন উইক্‌লি'টা খুলে বসলো মীনা। হঠাৎ খেয়াল হলো পাশের ঘরে কারা কথা বলছে। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা ছোট জালের জানলা, সবুজ রঙের পর্দা দেওয়া। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলো পাশের ঘর অন্ধকার। কৌতূহল হল মীনার। কালকের ঘটনাটা চকিতে মনে এলো। তাই তো, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার সঙ্গে কথা বলছে মিস্ রবার্টসন্? কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এবার ----।

মিস্ রবার্টসন্ কান্নাঝরা সুরে মিনতি করছে, "কেন আমাকে এভাবে ধরে এনেছ ---- কোন কিছুর অভাব নেই তোমাদের, একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করে কি লাভ হবে? তোমাদের পায়ে ধরছি ছেড়ে দাও আমাকে। ভগবানের দোহাই, ইজ্জত নষ্ট কোরো না আমার।"

এ যেন বুড়ী রবার্টসন্ নয়, কোন যুবতী মেয়ে। মীনার ভাবালু চোখের সামনে ভেসে ওঠে দূর-দূরান্তব্যাপী মরুভূমির মাঝে ছোট্ট ছায়াঘেরা মরূদ্যান। সারি সারি তাঁবু পড়েছে। বেদুইন দস্যুদল ঘিরে ধরেছে এক শ্বেতাঙ্গ যুবতীকে ----।

"একটু জল দেবে কেউ আমাকে ---- ধন্যবাদ ---- আর কব্‌জির বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দাও ---- বড্ড লাগছে ----।"

একটানা কতক্ষণ ধরে আকুতি করে চলেছে মিস্ রবার্টসন্ তার হিসেব রাখে নি মীনা। সে নিজেও যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

হঠাৎ শুনলো, "এই শোনো, লোকগুলো পাশের তাঁবুতে বসে মদ খাচ্ছে। এখুনি পালাতে হবে আমাদের, তাড়াতাড়ি করো।"

মীনা জানলার কাছে গিয়ে বললো, "কি হয়েছে মিস্ রবার্টসন্? তোমার ঘরে আলো জ্বালোনি কেন?

"স্স্স্, আস্তে ---- লোকগুলো এক্ষুণি শুনতে পাবে ----।"

মীনা যত বলে ও ঘরে তুমি ছাড়া কেউ নেই - বুড়ী কিছুতেই মানবে না সে কথা। এদিকে ঘরের আলোও জ্বালবে না। শেষে বিরক্ত হয়ে মীনা নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। ভাবলো ঘুমিয়ে পড়েছে জানলে আর ডাকাডাকি করবে না। কিন্তু সে আশা বৃথা। কিছুতেই জানলার কাছ থেকে নড়বে না বুড়ী।

"আমাকে এই গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে বাঁচাও, দোহাই তোমার। তুমিও তো মেয়েমানুষ, এভাবে তোমার বোনের ধর্ম নষ্ট হতে দেবে তুমি? আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে না পারো তো বিষ এনে দাও, তাই খেয়ে নিজের ইজ্জত বাচাবো ----।"

ষাট বছরের বুড়ীর মুখে এইসব প্রলাপ কতক্ষণ ধরে শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লো মীনা। বারান্দায় এসে আয়াকে ডাকলো; বললো নাইট নার্সকে এক্ষুণি ডাকো। সিস্টার আসতেই তেড়ে ফুঁড়ে উঠলো মীনা।

বদ্ধ পাগলের সঙ্গে থাকতে পারবে না সে। বাচ্চা দুটো ঘুমোতে পারছে না, তার নিজেরও বিশ্রাম দরকার। সারারাত ধরে এভাবে বুড়ীর পাগলামী শুনতে শুনতে তারই যে মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। কাল সকালেই অফিসার-ইনচার্জের কাছে কমপ্লেন করবে সে।

সিস্টার একটু থতমত খেয়ে বললো, "আমি এক্ষুণি ওকে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো, আর তোমাদের বিরক্ত করবে না। তোমার কোন ভয় নেই, আজ সন্ধ্যে থেকেই ওর দরজা লক্ করে রেখেছি ----।"

বুড়ীর জানলা দিয়ে কাকুতি মিনতি করার কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার

হল। দরজা তালাবন্ধ, তা না হলে কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত আজও। কি বিপদ!

মীনা গজগজ করতে থাকে, "মোট কথা কালই আমি মিসেস মেননকে বলবো একথা। ওয়ার্ডের মধ্যে এক বদ্ধ পাগলকে রাখা অন্য রুগীদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।"

সিস্টার ঘাড় হেঁট করে চলে গেল। একজন সিনিয়র অফিসারের স্ত্রী কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার তো হবেই, সিস্টারদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারেন অফিসার-ইন-চার্জ।

রাত্রে আর কিছু গণ্ডগোল করেনি বুড়ি, তবে মাঝ রাত্তির অবধি জেগে সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল মীনার। উঠে দেখে ব্রেকফাস্ট রাখা আছে পাশে। আজ শুক্রবার। সি.ও.-র উইক্‌লি ইন্সপেক্‌শন্‌ আজ। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। একজন সিস্টার ব্যস্তভাবে একগোছা ফুল রেখে গেল একটা পিতলের ফুলদানীতে। আয়া আগেই ধবধবে টেব্‌ল্‌ ক্লথ্‌ পেতে দিয়ে গেছে। দু'জনে ধরাধরি করে একটা স্ক্রীন্‌ ঢোকালো ঘরে। মীনার ভারি মজা লাগছিল দেখতে। সে জানে যেই ইন্সপেক্‌শন্‌ শেষ হবে অমনি স্ক্রীন্‌, টেব্‌ল্‌ ক্লথ্‌ ও ফুলসুদ্ধু ফুলদানী সব কিছু উধাও হবে এক সপ্তাহের মত।

দরজায় টোকা পড়লো, "আসতে পারি?"

দরজা খুলে একটি নার্স ঘরে ঢুকলো। এর আগে সব নার্সই দরকারমত ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকেছে, আবার কাজ শেষ হতেই খট্‌খট্‌ করে হীলের আওয়াজ তুলে চলে গেছে। ঘরে ঢোকার অনুমতি চায়নি কেউ।

ভিতরে এসে মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবেন না?"

মনে মনে ভারি অবাক হল মীনা।

বললো, "না, না, মনে করবো কেন? বসুন।"

পাশের চেয়ারে বসে পড়লো মেয়েটি।

এক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "আপনার পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা মিস্‌ রবার্টসন্‌, গত সপ্তাহে হাসপাতালে এসেছেন। ব্যক্‌বোনে মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রনা হয়, তারই চিকিৎসার জন্যে। আর

দু'দিনেই চিকিৎসা কম্‌প্লিট্‌ হয়ে যাবে কিন্তু জানি না ওঁকে আরও দু'দিন এখানে রাখা সম্ভব হবে কিনা। গত ছ'দিনে পাঁচবার ঘর বদলাতে হয়েছে ওঁকে। যেখানেই রাখা হচ্ছে অন্য রুগীরা অতিষ্ঠ হয়ে নালিশ করছে। তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। অথচ চিরদিন এমন ছিলেন না উনি। এক সময় এই হাসপাতালেই মেট্রন ছিলেন। ওঁর বাবা তখন রিটায়ার করে বিলেতে চলে গেছেন। মা তার ক'বছর আগেই মারা গেছেন। সংসারে নিজের বলতে ছিল শুধু একটি বোন।"

অল্পবয়সী, সুশ্রী, বয়স আন্দাজে বড় বেশী গম্ভীর এই মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে মীনার ভাবালু মন অর্ধেক শতাব্দী পেরিয়ে যায় ----।

এরিকার বাবা রিচার্ড রবার্টসন্‌ ভারতীয় রেলওয়েতে ইঞ্জিনীয়ার ছিল। প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কেটেছে এরিকা ও মারিয়া দুই বোনের। কিন্তু সুখ-শান্তি ছিল না তাদের সংসারে। উচ্ছল, প্রাণবন্ত ও অসাধারণ রূপবান রিচার্ডের যোগ্য সহচরী হতে পারেনি তার পত্নী মার্থা। দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েই অকালে স্বাস্থ্য ও যৌবন খুইয়ে বসেছিল সে। স্বামীর স্বেচ্ছাচারে বাধা দিতে চেষ্টা করেনি। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল তার শোবার ঘরটার অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে। স্ত্রীকে অপ্রয়োজনীয় আসবাবের মত গৃহকোণে ফেলে রেখে জীবনের পথে এগিয়ে গেছে রিচার্ড। নিজের স্বৈরাচারী জীবন সম্বন্ধে এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না তার। তার লীলাসঙ্গিনীরা গৃহেও ঠাঁই পেয়েছে কেউ কেউ - হাউসকীপার, গভর্নেস বা বাচ্চাদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে।

এরিকা ও মারিয়া দুই বোনের আকৃতি-প্রকৃতিতে আকাশছোঁয়া প্রভেদ। এরিকা অসাধারণ মেধাবী ও স্থিরবুদ্ধি। তবে তার চেহারায় স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু আকর্ষণীয় নেই। মারিয়া বাবার রূপ ও মার ক্ষীণ দেহ পেয়েছে। পড়াশোনায় মন নেই, সাজগোজ নিয়েই থাকে। দিদি-অন্ত প্রাণ। এরিকাও প্রাণের চেয়ে ভালবাসে ছোট বোনটিকে। দুই বোনে বয়সের তফাত প্রায় দশ বছর।

এরিকা যে বছর সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করলো সে বছরই মা মারা গেল। সংসারে খুব বেশী পরিবর্তন হল না তাতে। শুধু মিস্‌ গ্লোরিয়া

ক্রমটন্ নামে যে মহিলা গত তিন বছর ধরে মারিয়ার গার্জেন টিউটর হিসেবে ওদের বাড়িতে ছিল রিচার্ড তাকে প্রকাশ্যভাবে পত্নীত্বে বরণ করলো। সেটা শুধু কাগজে কলমে পরিবর্তন। গ্লোরিয়ার সঙ্গে রিচার্ডের ঘনিষ্ঠতার কথা কারোই অজানা ছিল না।

এর ক'বছর পরই রিটায়ার করলো রিচার্ড। এরিকা তখন দিল্লীতে নার্সিং-এর ট্রেনিং নিচ্ছে। ওর নতুন মা ওকে চিঠিতে জানালো যো ওরা স্বামী-স্ত্রী ইংল্যাণ্ড চলে যাচ্ছে - জাহাজে রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। মারিয়াকে কোলকাতায় এক মাসীর বাড়ি রেখে যাচ্ছে। ওদেশে গিয়ে সেট্‌ল্ হয়ে বসার পর ওদের দুই বোনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। রিচার্ড বা গ্লোরিয়া আর কোন খবর নেয়নি ওদের। অনেক চিঠি লেখালেখি করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এরিকা। পরে আত্মীয় হিতৈষীদের কাছে শুনেছে যে সৎ মেয়েদের ঝক্কি পোয়াতে রাজী নয় ওদের নতুন মা। ঝাড়া হাত-পা হয়ে স্বামীর ঘর করতে চায় সে।

রিচার্ডের অফুরন্ত উচ্ছলতায় বাঁধ পড়েছে এবার, সম্পূর্ণভাবে এখন স্ত্রীর করায়ত্ত সে। আরও খবর পায় যে রিচার্ডের সঞ্চয়ের কড়ি কপর্দকও এদেশে রেখে যায়নি তারা। আত্মীয়-বন্ধুরা এরিকের দায়িত্বহীন, হৃদয়হীন পিতার উদ্দেশে গালি দেয়। ওদের দুবোনকে সহানুভূতি জানায়। দু'একজন মাঝে মাঝে সান্ধ্যভোজে ডাকে কিন্তু এরিকা জানে এর বেশী আর কিছু আশা করা বোকামী। সে নিজের জন্যে ভাবে না।

ট্রেনিং শেষ করে হাসপাতালে কাজ করছে সে। কিন্তু রুগ্ন, লাজুক, সুন্দর মারিয়া - তার কি হবে ! জীবন সম্বন্ধে কোনদিন কোন মোহ ছিল না এরিকার। রুক্ষ মেধা দিয়ে শৈশব থেকে চুলচেরা বিচার করতে শিখেছে সে। স্বার্থপর, সৈরাচারী বাপের প্রতি অনুভব করেছে ভয় ও বিতৃষ্ণা, মেরুদণ্ডবিহীন মা'র জন্য ছিল শুধু অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণা। পৃথিবীতে একমাত্র ছোটবোনটিকেই ভালবাসে সে। এত সুন্দর, এত অসহায় বোনটিকে কিভাবে রক্ষা করবে সেই তার একমাত্র চিন্তা। সাধারণতঃ নার্সদের হোষ্টেলে থাকাই নিয়ম। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাইরে থাকার বিশেষ অনুমতি আদায় করলো এরিকা। ছোট একটি ফ্ল্যাট নিল দুই বোনের জন্যে। সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি করে এরিকা। কখনো বা রাত্রে ডিউটি পড়ে। বাড়িতে মারিয়া দিদির পথ চেয়ে বসে

থাকে। দিদির পছন্দ মত খাবার তৈরি করে রাখে, পরিশ্রান্ত দিদির বিশ্রামের ব্যবস্থা করে।

কয়েকটা বছর কেটে গেল এইভাবে। এরিকা ভেবেছিল এইভাবেই কাটবে জীবন। জীবনের কাছে এর বেশী যে কিছু পাওনা আছে জোর করে ভুলে থাকতে চায় সে কথা। অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে চায় জীবনের অন্য চাহিদাগুলো। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস কে বুঝতে পারে !

হাসপাতালে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পিটারের সঙ্গে। ওদের দূরসম্পর্কের কাকা হন পিটারের বাবা। এক সময় খুব হৃদ্যতা ছিল দু'টি পরিবারের মধ্যে। ওরা তখন লিলুয়ায় থাকতো। এর পর এরিকার বাবা অন্য জায়গায় বদলী হতে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছিল। আবার এক যুগ পরে দেখা।

"ইস্ কত বদলে গেছ তুমি ! নাম না দেখলে চিনতে পারতাম না তোমায়।"

"তুমিই কি বদলাওনি নাকি?" হাসি মুখে পালটা প্রশ্ন করে এরিকা।

পিটার দিল্লীর কোন্ এক ফার্মে কাজ করে। ওর এক বন্ধুকে দেখতে এসেছে হাসপাতালে।

"এত কাছে থেকেও দেখা হয়নি এতদিন - স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি দিল্লীতে আছ।"

বিকেল চারটেয় ডিউটি শেষ হবে এরিকার। তখন দেখা করার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল সে।

চারটেয় গেটের কাছে পৌঁছে দেখে পিটার তার স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করছে। দু'জনে কনাট্ প্লেসে গেল। 'গে-লর্ডে' খেতে খেতে অনেক কথা হল দু'জনে। পিটারের জীবনও সুখের নয়। ওর বাবা অকালে মারা যান এরিকারা লিলুয়া ছাড়ার ক'মাস পরেই। বড় ছেলে পিটার সবে কলেজে ঢুকেছে তখন। পড়াশোনায় ইতি দিয়ে রেলওয়ে ইন্স্টিটিউটে অ্যাপ্রেন্টিস্ হল। যে ক'টি টাকা পেতো মাকে পাঠাতো। খাওয়া থাকা ফ্রী। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত জেগে করিডরের আলোয় লেখাপড়া করতো। ওর ডরমিটারির অন্যান্য ছেলেরা তখন ঘুমে বিভোর। এইভাবে

দু'টো পরীক্ষা পাস করে ইঞ্জিনীয়ার হল সে। একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ছেড়ে দিল।

সেদিন রাত্রে অনেক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এলো না এরিকার। আলো জ্বেলে পা টিপে টিপে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। রোজকার সাদামাটা মেয়েটা আজ এ কোন্ মোহময়ী রূপ নিয়েছে। দু'চোখ তার স্বপ্নের ছায়া, ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপছে। মনে মনে নিজের বয়স হিসেব করলো এরিকা। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলো আয়নার কাছ থেকে। আলো নিভিয়ে বিছানায় ফিরে এলো।

ক'দিন পর সেই কথাই বলেছিল পিটারকে। আটত্রিশ বছর বয়স, রূপ নেই, যৌবন যায় যায়। কি দিতে পারে সে তাকে?

উত্তরে পিটার তাকে বুকে চেপে ধরে বলেছিল, "আই লাভ্ ইউ, এরিকা। তুমি আমার। তুমি আমার হও।"

ইণ্ডিয়া গেটে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বহু দুরে চলে এসেছে ওরা। অন্যান্য বায়ুসেবীরা অনেক আগেই ফিরে গেছে যে যার ঘরে। কিন্তু এ সব কিছুই খেয়াল নেই এরিকার। আটত্রিশ বছর বয়সে প্রথম বসন্তের জোয়ার এসেছে তার জীবনে। সে জোয়ারের জলোচ্ছাস তার সব সংস্কার, বিবেচনা ও সংযমের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখে মারিয়া তখনো জেগে বসে আছে। দু'কথা বলে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল এরিকা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো নিজেকে। আয়নার ওই মেয়েটি রোজকার সেই এরিকা নয়, আজকের এরিকা অন্য। একটি পুরুষের প্রেমের উৎসে স্নান করেছে তার কুমারী দেহ। কোমার্যের আবরণ ভেঙে প্রেমিকা হয়েছে সে।

এরপর দিনগুলি যেন প্রজাপতির ডানায় ভর দিয়ে ভেসে যায়। ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের সময় মারিয়াকে কিছুদিনের জন্যে মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবে স্থির করলো এরিকা। মেয়েটা একা একা থাকে। তাছাড়া ইদানীং কেমন যেন শুকনো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। কোলকাতা অবশ্য এমন কিছু স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়, তবু স্থান পরিবর্তন তো হবে। মারিয়া প্রথমে যেতে চায়নি। শেষে অনেক বুঝিয়ে -সুঝিয়ে রাজী করালো

এরিকা। আর একটা স্বার্থপর কারণও বুঝি ছিল মারিয়াকে পাঠানোর পিছনে। পিটারকে একান্তে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল সে।

মারিয়াকে ট্রেনে তুলে দিয়ে পিটারের সঙ্গে ফিরে এলো এরিকা। ঘরে ঢুকে কোটটা সোফার উপর ছুঁড়ে দিয়ে পিটারের দু'হাত ধরে বোঁ করে একটা চক্কর দিল ঘরময়। খুশী যেন আর ধরছে না। চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল পিটার।

এরিকা কার্পেটে হাঁটুগেড়ে বসে ওর কোলে মাথা গুঁজে ডাকলো, "পিট।"

"বলো।"

"কি ছাইপাঁশ পড়ছো, সরিয়ে রাখো ওটা।"

ম্যাগাজিনটা টিপয়ের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালো পিটার।

বললো, "চলো, ও ঘরে গিয়ে বসি।"

"বসি না শুই?"

এ ক'মাসের অন্তরঙ্গতায় মুখের আগল আলগা হয়ে গেছে। কুমারী জীবনের কঠোর অনুশাসনে বাঁধা কন্যা এখন কামোচ্ছলদয়িতা। নরম শয্যায় প্রিয়তমের বাহুপাশে তার প্রতি রোমে যেন নেশার আগুন ধরে। পিটার হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

"পিট ডার্লিং, একটা ওয়াণ্ডারফুল খবর আছে।"

"কি খবর?"

"কান্ট ইউ গেস?"

আঃ বলে ফেলো কি কথা ----।"

"আমার ভীষণ লজ্জা করছে। তুমি আন্দাজ করতে পারছো না, সিলি।"

ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারে পিটার। তার কামতপ্ত দেহ শিউরে কুঁকড়ে আসে।

হিমশীতল কন্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "হেঁয়ালী রাখো এরিকা। কি বলতে চাও বলো।"

গত ক'দিন ধরে এরিকার মনে বহুবার দোলা দিয়েছে কথাটা, কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারেনি। সুযোগ পায়নি। সিনেমা হলে ঠাসাঠাসি করে বসে, কিংবা পার্কে অন্যদের সামনে বলতে চায়নি সে। তার জীবনের মধুরতম কথাটি বলার জন্যে এমনি একটা মধুর নিভৃতির প্রয়োজন অনুভব করেছিল। মনে মনে পিটারের প্রতিক্রিয়ার একটা ছবি এঁকেছিল। কথাটা শুনে পিটার বুকে চেপে ধরবে ওকে। চুমু দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দেবে ওর। আনন্দবিহ্বল চোখে চেয়ে থাকবে ওর দিকে। গর্বে ভরে উঠবে এরিকার বুক।

পিটারের ঠাণ্ডা নিরুচ্ছাস কথাগুলো তীক্ষ্ণ ছুরির মত খান্ খান্ করে দিল ওর স্বপ্নের জাল।

থতমত খেয়ে ভীতু গলায় বললো, "মনে হচ্ছে আমার পেটা বাচ্চা এসেছে। গত মাসে পিরিয়ড হয়নি, এমাসেও দিন পেরিয়ে গেছে।"

"দু'মাস? তুমি নিজে নার্স হয়ে এমন বোকামী করেছ ! এর আগেই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যা হোক এখনও সময় আছে। যত শীগ্‌গীর পারো ওটা নষ্ট করে ফেলো।"

এরিকা চমকে উঠলো, "এ তুমি বলছো কি পিট? আমাদের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে চাও? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?"

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে পিটারকে কাছে টানার চেষ্টা করে, "ইউ আর জোকিং, কাম টু মী ডার্লিং, প্লীজ ----" ওর তলপেটে মুখ ঘষতে ঘষতে এরিকা বলে।

পিটার ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলো এরিকা। অন্ধকারের মমতায় ঢাকা নগ্নতা ফুটে উঠলো এবার - শুধু দেহের নয়, মনেরও। পিটারের কঠোর মুখের দিকে চেয়ে আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো এরিকা। তাড়াতাড়ি হাউসকোটে জড়িয়ে নিলো নিজেকে।

চরম দৈন্য ও রিক্ততার ছবি যেন সে, "পিট কি হয়েছে বলো। ডার্লিং, আমার উপর রাগ কোরো না প্লীজ। তুমি তো বলেছিলে আগামী বছর বিয়ে হবে আমাদের। না হয় ক'মাস আগেই হল বিয়ে, কি ক্ষতি হবে তাতে। না হয় লোকে জানবে বিয়ের আগেই গর্ভে সন্তান এসেছে, তাতেই বা কি আসে যায় ! আমরা তো পরস্পরকে ভালবেসেছি, কোন

পাপ স্পর্শ করবে না আমাদের অনাগত সন্তানকে।"

বলতে বলতে পিটারের দুটি পা চেপে ধরে এরিকা। দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা।

পিটারের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

ঝাঁঝালো গলায় বলে, "শোন এরিকা রবার্টসন্, তুমি নির্বোধ নও। বিছানায় শুয়ে লোকে অনেক কথাই বলে। সে সব কথা কেউ সিরিয়াস্‌লি নেয় না। তুমি নিশ্চয় ভাবোনি যে আমি তোমায় সত্যি সত্যি বিয়ে করবো। মিথ্যে স্তোকবাক্য শোনাতে চাইনা তোমায়। বিয়ে আমার স্থির হয়ে গেছে - পাত্রীকে তুমি চেনো, সে তোমারই বোন মারিয়া। কাল সকালের ট্রেনে কোলকাতা যাচ্ছি আমি। ভেবেছিলাম বিয়েটা সেরে কোলকাতা থেকে মারিয়া ও আমি চিঠি দেবো তোমায়, তাতেই জানাবো খবরটা।"

"না, মিথ্যে কথা !" চিৎকার করে ওঠে এরিকা, "স্কাউণ্ড্রেল ! লেচার ! কক্ষণো তা হতে দেবো না আমি।"

মাটি থেকে হাইহীল জুতোর একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে এরিকা। জুতোর পর টি-পট, তারপর কাপ, প্লেট, জাগ, কিউরিও, টিপয়। কপাল কেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে পিটারের। ঠোঁটে বিষাক্ত একটা হাসি ফুটে তার - ঘৃণা, অবজ্ঞা ও হিংস্রতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ সে হাসিতে। ওর হাসি এরিকা দেখতে পায় না, চোখের জলে তার দু'চোখ অন্ধ তখন। কর্কশ হাতে হিড়হিড় করে টেনে পিটার তাকে বেডরুমে নিয়ে এলো। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বিছানার উপর। তারপর আলো নেভালো। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো না এরিকা। এ যেন তার শরীর নয়, অন্য কারো দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে পিটার।

খানিক পরে যখন আলো জ্বললো তখনও নিথর কাটা গাছের মত পড়ে আছে এরিকা। শুকনো চোখে শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে - পিটারের দিকে নয়, কারো দিকে নয়। নিজের নগ্ন দেহটাকে ঢাকার চেষ্টাও করলো না সে। লজ্জা, ব্যথা, অপমান সব কিছুরই যেন মৃত্যু ঘটেছে। টাই'টা ঠিক করে পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়ালো পিটার। বেডরুমের দরজার কাছে গিয়ে কি ভেবে ফিরে দাঁড়ালো।

এরিকার উলঙ্গ দেহটার দিকে অবজ্ঞাভরা চোখে তাকিয়ে বললো, "বিদায় এরিকা রবার্টসন্ - তোমার এই রূপহীন দেহটাকে শেষবারের মত পুরুষসঙ্গ দিয়ে গেলাম। তোমার কপালে এ জিনিস আর কখনো জুটবে বলে মনে হয় না। আর একটা কথা, মারিয়া আমায় বিয়ে করছে এটা যদি তোমার মনঃপূত না হয় তবে এ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারো তুমি। বোন তো তোমার ভীষণ বাধ্য ! সত্যি কথা বলতে কি, আইদার ওয়ে, ইট্ মেক্স্ নো ডিফারেন্স টু মী। আই অ্যাম নট্ দ্য ম্যারিয়ং কাইণ্ড। তবে কিনা বোনটি তোমার তিন মাসের পোয়াতি ---- শুধু সে জন্যেই রাজী হয়েছি আমি ----।"

এরিকাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। সিঁড়িতে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ শুনলো এরিকা, শুনলো পিটার ল্যাম্‌ব্রেটা স্টার্ট করছে, তারপর ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল স্কুটারের আওয়াজ ----।

কতক্ষণ বজ্রাহতের মত পড়েছিল মনে নেই এরিকার। দূরে চৌকিদারের হুইসেলের শব্দে সম্বিৎ ফিরে এলো। উঠে বাথরুম গেলো। তারপর পা টিপে টিপে ফ্ল্যাটময় ঘুরে বেড়ালো। ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে ফলকাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সাইডবোর্ডের উপর রাখা মারিয়ার বাঁধানো ছবিটার দিকে। কাচের আড়াল থেকে মারিয়া যেন হাসছে।

"ও মাই গড !" ছুরিটা ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো এরিকা। মাথার মধ্যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার। হঠাৎ নিজের নগ্ন দেহটার দিকে দৃষ্টি পড়লো। টলতে টলতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিষ্করুণ কসাইয়োর চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো নিজেকে। ছিঃ! ছিঃ! এই রূপহীন প্রৌঢ়ত্বের পসরা নিয়ে কোন্ লজ্জায় প্রেমের স্বপ্ন দেখছিল সে! কিন্তু সে তো উন্মাদ নয়। তবে কি নিজেকেই স্তোক দিয়েছে এতদিন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। বঞ্চিত, উপোসী দেহটার লালসা মেটাতে চেয়েছিল যে কোনও ফিকিরে। ভালবাসার নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের পাপটাকেই চুনকাম করে ভদ্রদুরস্ত করতে চেয়েছিল নিজের শুচিবাইগ্রস্ত বিবেকের সামনে ----।

নিজের নির্মম দৃষ্টির ক্রুরতা আর সহ্য করতে পারে না সে। তাড়াতাড়ি সরে এলো আয়নার সামনে থেকে। ক্ষিপ্রহাতে কার্পেটের উপর থেকে জামা কাপড়গুলো তুলে পড়ে নিলো। তারপর দরজা খুলে

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন শরীর জুড়িয়ে যায়। মনের জ্বালাও জুড়োক এবার। চেয়ারটা রেলিং-এর কাছে টেনে এনে তার উপর উঠে দাঁড়ালো এরিকা। তারপর চোখ বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

"ইস্‌স্‌, তারপর?" রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে মীনা।

"তারপর আর বেশী নেই। প্রাণে মরেনি মিস্‌ রবার্টসন্‌ শুধু মেরুদণ্ড জখম হল। বাচ্চাটাও নষ্ট হয়ে গেল। ছ'মাস হাসপাতালে থেকে শরীরের জখম সারলো - তবে মনটাকে আর জোড়া দেওয়া গেল না। কি রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে ও নাকি বিশ্বের সেরা সুন্দরী আর ওর রূপের লোভে সবাই পাগল। দেশ বিদেশ থেকে নবাব বাদশারা লোক পাঠাচ্ছে ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ----। তবে পাগলামীটা এমনিতে অহিংস, শুধু আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। খুন চেপে যায় মাথায় ----। মাঝে মাঝে মেরুদণ্ডে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তখন হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ট্রিটমেন্টের জন্যে। তারপর বছর খানেক চাপা থাকে ব্যাথাটা। এবারও ট্রিটমেন্ট প্রায় কমপ্লিট্‌ হয়ে এসেছে, পরশু ছাড়া পাবে।"

"কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ওর কেউ হন?" সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে মীনা।

"আমি মারিয়ার মেয়ে রেবেকা। মারা যাবার আগে মা আমাকে সব খুলে বলেছিল।"

"আর আপনার বাবা?"

ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে রেবেকার গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত সুন্দর ঠোঁট দুটো।

"ও লোকটাকে আমার বাবা বলবেন না। ও আমার জন্মের জন্য দায়ী শুধু। আমার মা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেনি ওকে। মাসি আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর আমার মা লোকটার মুখদর্শন করেনি আর। তারপর বারো বছর বেঁচেছিল - শুধু আত্মধিক্কার আর অনুশোচনায় কেটেছে তার। জানি না বারো বছরের চোখের জলেও আমার মার পাপ ধুয়েছে কি না ----।"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "জানেন এ সব কথা যখন ভাবি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে মন। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না আর। আমি নান

হয়ে কোনও কনভেন্টে চলে যেতাম, শুধু দু'টো কারণে যাইনি। মা'কে কথা দিয়েছিলাম যতদিন মাসী বেঁচে থাকবে তার দেখাশোনা করবো আমি।"

"আর দ্বিতীয় কারণ?"

"দ্বিতীয় কারণ হল আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।"

মচ্ মচ্ জুতোর আওয়াজ শুনে দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। সি.ও., স্কোয়াড্রন্ লীডার সিন্হা এবং অফিসার-ইন-চার্জ মিসেস মেনন ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে নার্স ডি সুজা।

"হাউ আর মাই পেশেন্ট্স্ টু ডে?"

স্কোয়াড্রন্ লীডার সিন্হা মালা ও বাবলুকে পরীক্ষা করে সিস্টারকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন।

"আপনার এখানে কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো?" উইং কম্যাণ্ডার মেনন প্রশ্ন করলেন মীনাকে।

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নার্স রেবেকার মুখ। রুদ্ধশ্বাসে ওরই মুখপানে চেয়ে রয়েছে সে।

মীনা দু'এক মুহূর্ত থেমে উত্তর দিলো, "মোটেও কোন অসুবিধে নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

রেবেকার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মীনা এই প্রথম ওকে হাসতে দেখলো। সত্যি ভারী সুন্দর মেয়েটা। এত রূপ, এত অল্প বয়স, অথচ আত্মগ্লানির কি পাষাণ ভার বয়ে বেড়াচ্ছে বেচারী। ওর কি অপরাধ?

এর দু'দিন পর বাবলু ও মালাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো মীনা। এ কাহিনীর এখানে সমাপ্তি বলে ভেবে নিয়েছিল সে। নার্স রেবেকার কথা কখনো মনে পড়লে সহানুভূতিতে ভরে উঠতো ওর মন। তারপর আট বছর কেটে গেছে। দিল্লীতে বদলী হয়ে এসেছে ওরা।

সেদিন কিছু কেনাকাটা করতে কনাট্ প্লেসে গেছে, রাস্তায় এক ভদ্রলোক হাসিমুখে ওদের দিকে এগিয়ে এলো, "নমস্কার বৌদি ! নমস্কার তপনদা ! বৌদি চিনতে পারলেন না তো আমায়? এ আমার বৌ রেবা।"

সিঁথিতে সিঁদুর পরা খুশিতে ঝলমল মিষ্টি মেয়েটি দু'হাত তুলে

নমস্কার করলো ওদের। ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট সুজিত মুখার্জীর সঙ্গে এলাহাবাদে আলাপ ওদের। সুজিত তখন ব্যাচেলার। মেসের খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেলে মুখ বদলাতে আসতো ওদের বাড়ি।

এক এক দিন বলতো, "বৌদি আজ আপনার ছুটি, আমরা দু'ভাই রাঁধবো আজ। আপনি কিন্তু এদিকে আসতে পারবেন না।"

তপন বললো, "কবে বিয়ে করলে? আমরা কিন্তু খবর পাইনি। নেমন্তন্ন পাওনা আছে আমাদের। বিয়ে করে - বলতে নেই - চেহারাখানা বেশ বাগিয়েছ তো। তোমার বৌদির দোষ কি, আমিই চিনতে পারছিলাম না তোমায়!"

বউটি হাসিমুখে মীনার দিকে চেয়ে বললো, "আপনি আমাকেও চিনতে পারলেন না তো? আমি কিন্তু আপনাকে ভুলিনি। আমি রেবেকা।"

মনে পড়লো মীনার। এই কি সেই রেবেকা? বিশ্বাস হতে চায় না। যেন কোন রূপকথার গল্প শুনছে ---- সোনার কাঠির পরশ পেযে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত রাজকন্যা।

তপন বললো, "চলো মিকাডোতে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক।"

চারজনে একটা টেবিল দখল করে বসলো। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্পের তরঙ্গ। মীনার মনে বারে বারে আট বছর আগেকার ছবিগুলি ভেসে উঠছে। তপন ও সুজিত কি একটা বিষয় নিয়ে গুঢ় আলোচনায় ব্যস্ত। রেবা নিজের চেয়ারটা মীনার কাছে সরিয়ে আনলো।

"কি ভাবছো বৌদি?"

"সে দিন বলেছিলে ভগবানে বিশ্বাস কর না। ভাবছিলাম তোমায় আবার জিজ্ঞেস করবো ভগবান আছেন কিনা?" ঠাট্টা করে বলে মীনা।

"ভগবান আছেন কিনা এমন গুরুতর আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দেবার স্পর্ধা রাখি না আমি। তবে একটা কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে যদি ওজন করা যেতো তবে দেখা যেতো পৃথিবীতে পাপের চেয়ে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের দিকটাই অনেক বেশী ভারী।"

বলতে বলতে ওর গলা বুঁজে আসে, দু'চোখের কোলে টলটল করে

দু'ফোঁটা জল।

তারপর চকিতে চোখে মুখে দুষ্টুমীভরা হাসি ফুটিয়ে আগের কথাটার খেই ধরে বলে, "আর সেজন্যে ভগবানকে আজস্র ধন্যবাদ।"